হে মহাজীবন, আর এ তত্ত্ব নয়

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

টেরি ইগলটন (জন্ম ১৯৮৩) বহুদিনেদ্দর চেনা লেখক। ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস থেকে আস্তে আস্তে তিনি পৌঁছেছিলেন মার্কসবাদে। আর সেখানেই তিনি অনড় হয়ে আছেন। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এককালের আগুনখেকোরা অনেকেই এখন সংশয়ী উদারপন্থী বা পাক্কা রক্ষণশীল। কিন্তু ইগলটন আজও উঁচু গলায় নিজের মত ঘোষণা করে চলেছেন: ''ন্যাটো থেকে বেরিয়ে এসো। পুঁজিবাদ ছাড়ো। ব্যক্তিগত মালিকানা মুর্দাবাদ।'' তাঁর বক্তব্য খুবই চাঁচাছোলা। ''জীবনে নিশ্চয়ই টাকা ছাড়াও অনেক বড় বড় জিনিস আছে,'' তাঁর স্মৃতিকথায় (দ্বাররক্ষী, ২০০১) তিনি লিখেছেন। তার সঙ্গে অবশ্য এও যোগ করেছেন, তবে কিনা 'টাকাই সেগুলোর বেশির ভাগকে আমাদের নাগালে আনে।'' অর্থাৎ অর্থনীতির ভিতটাকে কিছুতেই এড়ানো যায় না।

অনেক বছর ধরেই ইগলটন একাধিক যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। পোস্টমর্ডানিজ্‌মকে তিনি ছাপ মেরেছেন ''রুগ্‌ণ রসিকতা'' বলে। অন্যদিকে রিচার্ড ডকিন্‌স্‌-এর বিরুদ্ধেও তাঁর জেহাদ। স্বভাবসিদ্ধ কড়া ভাষায় তিনি বলেছেন : ''ঈশ্বর নিয়ে ডকিন্‌স্‌-এর বইটিকে আমি আক্রমণ করেছিলাম কারণ আমি মনে করি ধর্মতাত্ত্বিক দিক দিয়ে তিনি নিরক্ষর।''

এসব খবর সকলের কাছে পৌঁছয় না। কলকাতার বাজারে চাহিদা অনুযায়ী জোগান হয় নানা উল্‌টো-পাল্‌টা বই-এর। আকাদেমিআ-ও এখন পোস্টমর্ডানিজ্‌ম -এর নতুন অবতার, ঐপনিবেশিক ও উপনিবেশ - উত্তর চর্চা-য় আগ্রহ দেখাচ্ছে। মার্কসবাদ এই মুহূর্তে আর তেমন ফ্যাশনেব্‌ল্‌ নয়। তাই ইগলটন বা ফ্রেডরিক জেমসন-এর মতো মার্কসবাদী সাহিত্য - সমালোচকের নতুন বইপত্র সহজে মেলে না। অথচ ইগলটন-এর তত্ত্বর পরে (আফটার থিওরি) বইটি সব জিজ্ঞাসুরই পড়া উচিত। তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব : একটি ভূমিকা (১৯৮৩, সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৯৬) পড়ে বছরের পর বছর ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা - বৈতরণী পার হয়েছেন। কিন্তু তার পরেও যে তাঁর কিছু বলার ছিল ও আছে সে-খরব অনেকেই রাখেন না।

তত্ত্বর পরে (২০০৩)-ই ইগলটন -এর শেষ বই নয়। গত পাঁচ বছরে তাঁর আরও পাঁচটি বই বেরিয়েছে। তার একটি সাহিত্য - বিষয়ক : কী করে কবিতা পড়তে হয় (হাও টু রিড আ পোএম, ২০০৬), অন্যটি দর্শন নিয়ে : জীবনের অর্থ (মিনিং অফ লাইফ, ২০০৭)। তবে সংস্কৃতির, ব্যাপারে তত্ত্বর পরে-ই তাঁর শেষ বই। এখানে সেটি নিয়ে কিছু বলব। যাঁদের পক্ষে বইটি জোগাড় করা সহজ নয় (আমাকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বিদেশ থেকে আনাতে হয়েছে) বা ইন্টারনেট খুলে ইগলটন সম্পর্কে খবরাখবর জানার সুযোগ নেই, তাঁদের কথা ভেবেই আগে অত কথা লিখলুম। মূলত তাঁদের জন্যেই নিচের কথাগুলো বলছি। মাত্র ২২৭ পাতার বই; আটটি অধ্যায়ে ভাগ করা। প্রথম অধ্যায়ের নাম 'বিস্মৃতির রাজনীতি'। ''রাজনীতি'' শব্দটি এখন ব্যাপক চলছে : অনুবাদের রাজনীতি, রাস্তার খাবারের রাজনীতি - সবকিছুরই রাজনীতি আবিষ্কার হয়েছে। এক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে প্রায় সব পি এইচ. ডি গবেষণায় এককালে 'বেদান্ত' থাকত : কালিদাসে বেদান্ত, ভারবিতে বেদত্রান্ত, মাঘে বেদান্ত, ইত্যাদি। ঠাট্টা করে কেউ কেউ বলতেন : শুধু দুটো গবেষণা বাকি আছে, পাঁজিতে বেদান্ত আর রেলপথের টাইম টেবিলে বেদান্ত। রাজনীতিরও এখন সেই দশা। নানা অর্থে কারণে - অকারণে শব্দটি ব্যবহার করার ফলে তার তাৎপর্যই হারিয়ে যাচ্ছে।

ইগলটন অবশ্য সে-পথের পথিক নন। তিনি বরং আমাদের মনে করিয়ে দেন: তত্ত্বর স্বর্ণযুগ শেষ। তার আদি প্রবক্তারা যা লিখেছিলেন, তাঁদের অনুগামীরা তেমন মৌলিক কিছু হাজির করতে পারেন নি। তবে সংস্কৃতিতত্ত্বর বাজার এখনও ভালো। ইওরোপ-আমেরিকার ছাত্রছাত্রীরা জনপ্রিয় সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেন। যে-সব বুড়ো বিদ্বান্‌ আজও মনে করেন জেফ্রি আর্চার-এর চেয়ে জেন অস্টেন বড় কথাসাহিত্যিক, ঝাঁ -ঝকঝকে ছোকরারা তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখে। পুরনো আমলে রবার্ট হেরিক-এর কবিতায় একটি মেটোনিম লক্ষ্য না করলে সেই ছাত্রকে তার বন্ধুরাই দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিত। আর এখন কেউ যদি মেটোনিম বা হেরিক-এর নাম শুনে থাকে, তাকেই বরং নিচু নজরে দেখা হয়। যৌনতাই আজকাল গবেষণার একমাত্র উপযুক্ত সামগ্রী। টিভি সেট- এর সামনে থেকে ন্যানোমিটার না-নড়েও পি এইচ. ডি থিসিস লেখা যায়।

তার ফল হয়েছে এই যে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনের উদ্ভবের আগের সমবেত ও সফল রাজনৈতিক সংগ্রামে স্মৃতি হারিয়ে গেছে। মানুষকে এই ভাবেই ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে অর্থনীতির মূল প্রশ্নগুলি। ইগলটন বলেছেন, উপনিবেশ - উত্তর চর্চার আরও ভাবালু ধারাগুলোয় যা ধরে নেওয়া হয়, বেশির ভাগ মার্কসবাদীই তেমন ধরে নেন নি। তাঁরা ভাবতেন না: 'তৃতীয় বিশ্ব' মানেই ভালো আর 'প্রথম বিশ্ব' খারাপ। তাঁরা বরং জোর দিয়েছিলেন ঔপনিবেশিক আর উপনিবেশ - উত্তর রাজনীতির শ্রেণী বিশ্লেষণে।

তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বে জাতীয় বিপ্লবের আংশিক ব্যর্থতার দরুন উপনিবেশ - উত্তর তত্ত্ববিদ্‌রা জাতীয়তার ব্যাপারে কিছুই বলতে চান না। উপনিবেশ - বিরোধী সংগ্রামে জাতীয়তাবাদ যে একদা আশ্চর্যরকমে সুফল শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছিল, এটাই তাঁরা বোঝেন না। জাতীয়তাবাদের মধ্যে তাঁরা দেখতে পান শুধুই উগ্র স্বাজাত্যবোধ বা জনগোষ্ঠীগত আধিপত্যবাদ। শ্রেণী ও জাতির জায়গায় এখন এসেছে এথ্‌নিসিটি, ছোটোবড় প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এর ফলেই উপনিবেশ - উত্তর জগতের প্রশ্ন কার্যত রাজনীতিবিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এথ্‌নিসিটি তো অনেকটাই সংস্কৃতির বিষয়, তাই ফোকাসটাও সরে গেছে রাজনীতি থেকে সংস্কৃতিতে। আর্থিক বৈষম্য, শ্রমিকদের সংগ্রাম এগুলো আর কোনো সমস্যা নয়। অথচ তথাকথিত ভুবনায়নের যুগেও বড়লোকরাই গ্লোবাল, যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারে; গরিবরাই লোকাল, নিজের দেশ ছেড়ে নড়ার সুযোগ নেই।

এরপরে ইগলটন আলোচনা কেরেছেন 'তত্ত্বর উত্থান ও পতন' নিয়ে। একদা পুঁজিবাদ - বিরোধী সংগ্রামে পাশাপাশি আধুনিকোত্তর তত্ত্বগুলির উদ্ভব হয়েছিল। ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে জঙ্গি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। নাটকীয়ভাবেই সেটির গতি কমে গেল। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর পায়ে বেড়ি পরানো হলো, ইচ্ছে করে তৈরি করা হলো বেকারি। তখনই বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে গেল তত্ত্ব। দেখা দিল তেলের সংকট, উগ্র দক্ষিণপন্থার জয় ও বিপ্লবী আশায় ভাঁটার টান। তার পরেই, প্রায় ১৯৮০ পর্যন্ত ছিল সংস্কৃতিতত্ত্বর রমরমা। প্রথাগত বামপন্থার বিস্তর খুঁত ধরা হলো: শিল্প, সুখ, লিঙ্গ (জেন্ডার), ক্ষমতা, যৌনতা, ভাষা, পাগলামি, বাসনা, আধ্যাত্মিকতা, পরিবার, শরীর, বাস্তুতন্ত্র, অচেতন, এথ্‌নিসিটি, জীবনচর্যা, আধিপত্য (হেজিমনি) -এগুলোর সবকিচু নাকি প্রথাগত বামপন্থা অগ্রাহ্য করেছে। ইগলটন বলেছেন: খুব ক্ষীণদৃষ্টি না হলে যে কারুরই নজরে পড়বে এ হলো মানুষের শারীরবৃত্তর এক বিবরণ যাতে ফুসফুস ও পেট বাদ রাখা হয়েছে। অথচ এ বলো সেই মধ্যযুগের শারীরবৃত্তর এক বিবরণ যাতে ফুসফুস ও পেট বাদ রাখা হয়েছে। অথবা এ হলো সেই মধ্যযুগের আইরিস সন্ন্যাসীর মতো, যিনি একটি অভিধান সঙ্কলন করেছিলেন, কেন কে জানে, 'এস' হরফটি বাদ দিয়ে।

প্রথাগত বাম রাজনীতি - সে যুগে যার মানেই ছিল মার্কসবাদ - কি সত্যিই অমন তালকানা ছিল? ইগলটন মনে করেন : ঘটনা তা নয়। গেওর্গ লুকাচ, ভালটের

বেনিয়ামিন, আন্তোনিও গ্রামশি থেকে টেওডোর আডোর্নো, এর্নস্ট ব্লশ, লুসিয়ঁ গোল্ডমান, জ্যাঁ-পল সার্ত্র, ফ্রেডরিক জেমসন -এঁরা যৌনতা ও প্রতীকিতা, শিল্প ও অবচেতন, জীবন থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা ও চেতনার রূপান্তরকে অবহেলা করেন নি। বিশ শতকে ঐ ধরণের চিন্তার চেয়ে সমৃদ্ধতার কোনো উত্তরাধিকার নেই। হাল আমলের সংস্কৃতি চর্চা (কালচারাল স্টাডিজ) এই উত্তরাধিকারের খেই ধরেই এগিয়েছে, যদিও তার অনেকটাই পূর্বসূরিদের বিবর্ণ ছায়া।

'পশ্চিমী' মার্কসবাদের উৎপত্তি হয়েছিল খানিকটা রাজনৈতিক অক্ষমতা ও মোহভঙ্গ থেকে। এককালের জঙ্গি বিপ্লবী ধারাকে এতে ভদ্রস্থ করে তোলা হলো। রাজনৈতিক অক্ষমতা ও মোহভঙ্গ থেকে। এককালের জঙ্গি বিপ্লবী ধারাকে এতে ভদ্রস্থ করে তোলা হলো। রাজনৈতিক দিক থেকে এটি কিন্তু একেবারেই ফোক্‌লা। রবার্ট জে. সি. ইয়ং থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ইগলটন দেখিয়েছেন: কমিউনিজমই ছিল প্রথম ও একমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচি যাতে নানা ধরণের প্রভুত্ব ও শোষণ (শ্রেণী, লিঙ্গ ও উপনিবেশবাদ) এর পারস্পরিক সম্পর্ক লক্ষ্য করা হয়েছিল; এগুলির অবলোপ না করতে পারলে কোনোটির থেকেই মুক্তি সম্ভব নয় - এও জানা ছিল। লুই আলতুসের, রলাঁ বার্ত জুলিয়া ক্রিস্তেভা, জাক দেরিদা - এঁরা সবাই ছিলেন বামপন্থী শিবিরের লোক, মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁদের গ্রহণ বর্জন মেলানো একটা সম্পর্ক ছিল। পরে সকলেই অল্পবিস্তর ঘুরে গেলেন। জুলিয়া ক্রিস্তেভা ও তেল কেল পত্রিকাগোষ্ঠী তো আশ্রয় নিলেন ধর্মীয় মরমিয়াবাদে। ইংল্যান্ড -এ ১৯৬০ ও ১৯৭০ -এর দশকের সংস্কৃতি - বিশেষজ্ঞরা এখন যোগ দিয়েছেন অ-মার্কসবাদী শিবিরে। ১৯৮০ ও ১৯৯০ -এর দশকে তাঁদের রূপ দাঁড়াল রাজনীতিবিচ্যুত (ডি পলিটিসাইজ্‌ড্‌)।

এইভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে ইগলটন লাভ - ক্ষতি হিসেবে করেছেন। ইচ্ছে করে দুর্বোধ্য লেখার তিনি বিরোধী। পরাপ্রশ্ন (মেটা-কোয়েশ্চেন) দিয়ে যে সরাসরি বিচারমূলক প্রশ্নকে হঠানো যায় না - এই তাঁর মত। কোনো সমালোচনামূলক প্রকল্পকেই তিনি অভেদ্য বলে মনে করেন নি; সবগুলোই সংশোধনের যোগ্য। তাঁর মনে হয়, সংস্কৃতিতত্ত্ব কথা দিয়েছিল: কয়েকটি মৌলিক সমস্যাকে ধরা হবে, কিন্তু মোটের ওপর সে-কাজে ওটি ব্যর্থ হয়েছে।

শেষ চারটি অধ্যায়ের মূল সুরটি দার্শনিক ও রাজনৈতিক। পুঁজিবাদী নীতিবোধ (এথিক) অনুযায়ী জীবনে সফল হওয়াই শেষ কথা। তার বিরুদ্ধে ইগলটন তুলে ধরে সমাজবাদী নীতিবোধকে। বিষয়মুখিতা (অবজেক্‌টিভিটি)- কে তিনি সম্মান করেন; মানুষের স্বভাব - এই ধারণাটিকে তিনি ছাড়তে রাজি নন। মার্কসকে তিনি চিহ্নিত করেছেন ধ্রুপদী নীতিবাদী (মরালিস্ট) বলে। মনে হয় মার্কস নিজেও সে -বিষয়ে সজাগ ছিলেন না, ''যেমন দান্তে সজাগ ছিলেন না তিনি মধ্যযুগে বাস করছেন।'' মানুষকে রাজনৈতিক জীব না - ভেবে সাংস্কৃতিক জীব ভাবায় ইগলটন-এর আপত্তি আছে। তিঙ্কি মনে করিয়ে দেন, আমরা ঐতিহাসিক জীব বলেই সর্বদা এক পরিবর্তনের প্রবাহে থাকি।

এফ. আর. লীভিস তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বলতেন: যা ইচ্ছে তা-ই পড়ো। ইগলটন তাঁর মাস্টারমশাই -এর কথামতো চলেন। বাইবেল -এর পুরনো নিয়ম ও নতুন নিয়ম সংক্রান্ত গবেষণা থেকে শুরু করে আমাদের বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন-এর মতামত - সবেরই খবর তাঁর জানা। নীতি - দুর্নীতির প্রশ্নে শেক্‌পিয়র -এর নাটক, ম্যাকবেথ ও রাজা লিয়র, থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ইগলটন তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

বইটির শেষে, উত্তরকথন-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র -র হালচাল নিয়ে তাঁর তীব্র আপত্তি প্রকাশ পেয়েছে। ইওরোপ যেভাবে তার কাছে হাঁটু গেড়ে বসছে তাতেও তিনি বিরক্ত। তবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জর্জ বুশ-ই আমেরিকা নয়, এক সত্যিকারের আমেরিকা আছে। সেই রাজনৈতিক বন্ধু ও সহযোদ্ধাদের উদ্দেশে তিনি বইটি উৎসর্গ করেন (গোড়ায় অবশ্য বইটি উৎসর্গ করা আছে ইগলটন-এর মা-র স্মৃতিতে)।